লালমাটি

বামপন্থী সংগঠন ও গণ-আন্দোলনের আবহে বীরভূম, ১৯৪৭-১৯৭১

তোমার দিকে ওরা ছুঁড়ে দিয়েছিলো মৃত্যু,
কিন্তু ওরা জানতো না,
কোনো কোনো মৃত্যু জীবনের চেয়েও সতেজ মহিমান্বিত,
তোমার মৃত্যুর কাছে কোটি কোটি জীবন আজো নতজানু,
তোমার গুলিবিদ্ধ শরীর এখনো
রাজপথ-উপচে-পড়া মিছিলের সামনে।
যেখানে সমাজ বদলে ফেলার প্রেরণায় বাঙময় হয়
কোনো তরুণ কণ্ঠ, সেখানে বেজে ওঠে তোমার কণ্ঠস্বর,
যেখানে বুলেটের আঘাতে ঢলে পড়ে কোনো সংগ্রামীর শরীর,
সেখানে আবার লাফিয়ে পড়ে তোমার দীর্ঘ, ঋজু দেহ,
যেখানে প্রতিবাদে উত্তলিত হয় বাহুর অরণ্য,
সেখানে সবচেয়ে উঁচু তোমার সূর্যঝলসিত হাত।

—শামসুর রাহমান, "তোমারই পদধ্বনি" (১৯৯২)

অবতরণিকা

মহম্মদবাজার থেকে মোরগ্রামগামী জাতীয় সড়ক বরাবর কিছুটা এগোলে গণপুরের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ছায়া-পড়া আঁকাবাঁকা পথ ধরে পৌঁছে যাওয়া যায় দামড়া : ঝাড়খণ্ডের কোল ঘেঁষা একটি বীরভূমী গ্রাম যা আজও অনুন্নত, প্রত্যন্ত। এই গ্রাম থেকেই শুরু হোক আমাদের পথ চলা, কথা বলা।

সাল ১৯৪৯, জুন মাস। বাংলা সনের আষাঢ়। তখনও দু'বছর হয়নি দেশভাগের ও ক্ষমতা হস্তান্তরের। সেই সময়ে স্থানীয় জোতদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে দামড়ায় গড়ে ওঠে এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন যার নেতৃত্বে ছিলেন ধরনী রায়,

দেবেন রায়, সৌরীন মুখার্জী (কুমকুম) ও টুরকু হাঁসদার মত বামপন্থী সংগঠকেরা। দামড়ার পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় চল্লিশটি গ্রামে ক্ষেতমজুর কৃষকদের বসবাস; তারা মূলতঃ আদিবাসী। এখানে জোতদার-মহাজনদের শোষণ ছিল প্রবল। ফলে মজুরী, তেভাগার দাবিতে এবং মহাজনী শোষণের প্রতিবাদে দ্রুত গড়ে ওঠে সংগ্রাম। শুরু হয় জোতদারদের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলনও। নেতৃত্বের এই সংগঠনদক্ষতা ও কর্মতৎপরতা এবং তাতে মানুষের সাড়া লক্ষ্য করে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত হয়ে পড়ে স্থানীয় জোতদার-মহাজন। ২৪শে জুন ১৯৪৯ জোতদার সরোজাক্ষ ঘোষাল মহম্মদবাজার থানায় মিথ্যে অভিযোগে ডাইরি করে দেবেন রায়, সৌরীন্দ্র মুখার্জী (কুমকুম) ও অন্যান্য অনুগামীদের বিরুদ্ধে। মিথ্যে অভিযোগের মধ্যে ছিল চুরি, দৈহিক নির্যাতন, ও অন্যান্য দুষ্কর্ম। এই অভিযোগের ভিত্তিতে একজন হেড কন্‌ষ্টেবল্‌ ও ছ'জন সেপাইয়ের ফোর্স পাঠানো হয়; সঙ্গে যায় ডি.আই.বি.এস.আই.-এর একজন ও একজন ওয়াচার। ২৫শে জুন দামড়া থেকে গ্রেপ্তার হন রুহি দাস, দুখু লেট, গোলাব লেট ও বাউল লেট। একই দিনে পুলিশবাহিনী নিমপাহাড়ী গ্রামে টুরকু হাঁসদার বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশী চালিয়ে কৃষকনেতা দেবেন রায় ও সরোজ কুমার হাজরা এবং ছাত্রনেতা সৌরীন্দ্র মুখার্জী (কুমকুম)-কে গ্রেপ্তার করে দামড়ার পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বন্দীদের জিপে করে নিয়ে যাওয়ার পথে দেবেন রায়ের পা বুটের লাথি মেরে ভেঙে দেওয়া হয়। এইসব খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে। বন্দী নেতাদের মুক্তি ও অন্যান্য দাবী সহ উত্তাল-উত্তপ্ত কয়েক হাজার কৃষক-জনতা টুরকু হাঁসদার নেতৃত্বে লাল ঝাণ্ডা ও তীর-ধনুক হাতে মিছিল করে পুলিশ ক্যাম্পে হাজির হয়। ক্রুদ্ধ, সশস্ত্র জনসমাগমে সন্ত্রস্ত পুলিশবাহিনী মুক্তি ভট্টাচার্য্যের বাড়ির ওপর তলায় উঠে গিয়ে আশ্রয় নেয় ও শুরু করে নির্বিচারে গুলি চালানো। ৩১ রাউণ্ড গুলি চলায় খুন হন দাশু মাঝি, কুদনো মাঝি, হাবল লেট ও মানিক লেট। নিখোঁজ ও মারাত্মক আহত হন আরো অনেকে। মারাত্মক আহত হয়ে বেনাগড়িয়া হাসপাতালে মারা যান মুক্তি লেট। অপর পক্ষে গুরুতর আহত হন একজন : কন্‌ষ্টেবল্‌ রামযশ পাণ্ডে। তার বুক থেকে পুলিশী আলামত হিসেবে উদ্ধার করা হয় চারটি রক্তমাখা তীর।

'স্বাধীনতা'-উত্তর বীরভুমের তথা পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে দামড়ার পঞ্চ-শহীদের কথা আমাদের আর তেমন মনে নেই। ফি বছর আষাঢ় মাসে (২৫শে জুন) বীরভূমের কোন কোন প্রান্তে কৃষকসভা শহীদদের স্মরণে 'দামড়া দিবস' পালন করে ঠিকই, কিন্তু তা নেহাতই আনুষ্ঠানিক পারম্পর্য রক্ষার তাগিদে। অথচ এমনই আরেকটি ঘটনার কথা মনে আসে যা ঘটেছিল প্রায় দু'দশক বাদে দামড়ার মতই আরেকটি জোত গ্রামে, উত্তরবঙ্গে,২৫শে মে ১৯৬৭ সালে। এই নেপালসীমান্ত ঘেঁষা গ্রামটির নাম আমরা কমবিস্তর সকলেই জানি : নকশালবাড়ি। দামড়া ও নকশালবাড়ির তুলনা করা নানা

কারনেই হয়ত উচিৎ নয়, বিশেষ করে দুটি ঘটনার মাঝে বিস্তর সময়ের ফারাকের কথা মাথায় রেখে। তবু যদি আমরা এই দুটি ঘটনাকে (কৃষক) আন্দোলনের নিরিখে অনুঘটক মুহূর্ত হিসেবে কল্পনা করি— তাদের জায়মান সম্ভাবনার ফলশ্রুতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে একরকম অনধিকার তুলনা খাড়া করেই ফেলি— তবে কিছুটা অবাক হতেই হয়।

দামড়ার ঘটনার কৃষকসভা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করে। পরিশেষে দামড়া ঘটনাবলী সম্পর্কে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে সাময়িকভাবে ফয়শালা হয়। মূল শর্তগুলি এই রকম : কৃষাণ প্রথার বীজধান কেটে নেওয়ার পর ১/৩শ পাবে কৃষাণ, ২/৩শ ভাগ পাবে জোতদার; যদি তার জন্য নির্দিষ্ট কাজের সময় কৃষাণ কোন মজুর লাগায় তবে তাকে সইয়া প্রথায় মজুরী (টাকায় বা জিনিসে) ফেরত দিতে হবে অর্থাৎ ২৫ ভাগ বৃদ্ধি ধরে; কৃষাণরা নিজের কুঁড়েঘর ছাওয়ার জন্য খড় পাবে। এই রোয়েদাদ ঘোষণা করতে গিয়ে তৎকালীন বীরভূম জেলাশাসক পি.পি.আই. বৈদ্যনাথ অঞ্চলে আরো একটি বিদ্যালয় খোলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন ও জমি চাষীদের এবং জনসাধারণের জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস দেন। বিচারে যদিও টুরকু হাঁসদা, আশু বাউড়ী ও অভিলাষ বাউড়ীর কারাদণ্ড হয়, এ-কথা বলাই যায় যে দামড়ার আন্দোলন তার বেশ কিছু লক্ষ্যে, অন্ততঃ আঞ্চলিক স্তরে, সফল হয়েছিল। তবু উদাহরণ হিসেবে বা প্রভাবের দিক থেকে এই মুহূর্তটি জেলা বা রাজ্যে তেমন ব্যাপ্তি বা প্রচার পেল না; দেশে তো নয়ই। অন্যদিকে নকশালবাড়ির দেশ-কাল ব্যাপী প্রভাব ও চলমান বিস্তৃতির কথা সর্বজনবিদিত। এই গ্রামীণ আন্দোলনের মুহূর্তটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে, মফস্বলে, শহরে; মূলতঃ যুব ও ছাত্ররাজনীতির সংশ্রয়ে। রেডিও পিকিং যার বর্ণনা করতে গিয়ে বলে : ভারতে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। বীরভূমেও জ্বলে ওঠে বিপ্লবকামী এই আন্দোলনের ছোঁয়াচে আগুন। এত তীব্র সেই জ্বলে-ওঠা যে ঐতিহাসিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের দেশব্যাপী বিস্তারের ইতিহাস লিখতে বসে ডেবরা-গোপীবল্লভপুরের সঙ্গে বীরভূমকে তুলে ধরেছেন অভ্যুত্থানেরক্রমিক তৃতীয় জ্বলনাঙ্ক হিসেবে—নকশালবাড়ি ও শ্রীকাকুলমের পরেই, ১৯৭১-এর বীরভূম। বলা চলে, বাকিরা যখন হাঁপিয়ে পড়ছে, তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল বীরভূম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কী এমন বারুদ জমে উঠেছিল ১৯৬৭-৭১-এ যার ফলে এই বিস্ফোরণ? কেন দামড়ার অভিঘাত সীমিত, আঞ্চলিক, যেখানে নকশালবাড়ি হয়ে উঠল ব্যাপক? বিভিন্ন মূল্যায়নে ও ভাষ্যে জোর দেওয়া হয়েছে আদর্শের ভূমিকার উপর যা একটি বিশুদ্ধ বৈপ্লবিক যুগধর্ম ও মুহূর্তের জন্ম দেয় ১৯৬৭-৭১-এ। এই চিন্তাধারার জনক হিসেবে হয়ত চিহ্নিত করা চলে স্বয়ং চারু মজুমদারকে। একভাবে এ-কথা অনস্বীকার্যও। তবে সমস্ত ঘটনাই মতান্তরে নানা ঐতিহাসিক ধারার অভিসৃতি এবং নকশালবাড়িও এর ব্যতিক্রম নয়। এমন একটা যুক্তি কানু সান্ন্যালের লেখায় কোথাও কোথাও উঁকি

দেয় । এর মানে এই কখনই নয় যে ‘মুহূর্ত’ হিসেবে ঐতিহাসিক সমকেন্দ্রিকতার ঊর্দ্ধেনকশালবাড়ির কোন নিজস্বতা, স্বকীয় বিশিষ্টতা, এবং সেই-অর্থে বিশুদ্ধতা নেই । পূর্বসূরি রাজনৈতিক ধারাগুলির সহজ যোগফল নকশালবাড়ি নয় ঠিকই; তবে এই ব্যাপক অভ্যুত্থানের চরিত্র বুঝতে হলে হয়ত এই ক্রমবিবর্তমান ধারাগুলি ও তাদের সঙ্কলনের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেও চলে না । এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে চেষ্টা থাকবে বীরভূমের মাটিতে এই ধারাগুলির প্রকাশ ও বিবর্তনের রূপটুকু বোঝার । অবশেষে দুঃসাহসিক প্রয়াস করা হবে মুহূর্ত হিসেবে বীরভূম ’৭১-এর ‘স্বাতন্ত্র্য’ নিরূপণের । অর্থাৎ, কেমন এই ‘আধিক্য’, কী সেই তথাকথিত ‘অতিরিক্ততা’-র চরিত্র, যা বীরভূম ’৭১-কে ঐতিহাসিক পাটীগণিতের ঊর্দ্ধে স্থান দেয়?

বিষয়ে ঢুকব । তার আগে বলে নেওয়া দরকার স্বাধীনতা-উত্তর বীরভূম নিয়ে এই জেলা/ অঞ্চলের মানুষ বিশেষ আগ্রহী এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের বিস্তর লেখালিখিতে । এই ব্যতিক্রমী মনীষার অগাধ সুবিধে পেয়েছি ও নিয়েছি আমি । কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি ।

বীরভূম ’৪৭-৬৬ : সিঁদুরে মেঘ (অথবা উদ্যোগ পর্ব)

বীরভূমে ১৯৩৮ সালে জেলা কম্যুনিষ্ট্ পার্টি তৈরি হওয়ার পর পার্টি সংগঠনের বিস্তারের সাথে সাথে কৃষক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন ও অন্যান্য গণসংগঠনও গড়ে উঠতে শুরু করে । ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে এই সমস্ত সংগঠন গড়ার কাজে নেতৃত্ব দেয় প্রধানত ব্রিটিশজেলফেরত প্রাক্তন বিপ্লবীরা— তাঁদের অনেকে সরাসরি যুগান্তর গোষ্ঠী থেকে আসেন (যেমন ভালাষ গ্রামের প্রভাতকুসুম ঘোষ); আসেন যুগান্তরের সাথে সম্পর্ক থাকা সাঁইথিয়ার দ্বারিক ব্যানার্জীর মত ব্যক্তিরা; আবার কেউ আসেন অনুশীলন গোষ্ঠীর থেকে (যেমন লাভপুরের ফিনতোড় গ্রামের বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী), আবার যুগান্তরের বাইরে থেকে আসেন সুরেন ব্যানার্জী, কালীপদ বশিষ্ঠ প্রমুখ; কংগ্রেসী অসহযোগ আন্দোলন থেকেও আসেন নগরির সুধীন্দ্র কুমার রায়ের মত বহু মানুষ । এই কাহিনী সবিস্তারে বলার সুযোগ আমাদের এখানে নেই । তবে এটুকু বলা দরকার যে একই পার্টির ছাতার তলায় এই বিবিধ সংগঠনগুলি তৈরি হলেও অন্ততঃ ছাত্র ও কৃষক সংগঠন দুটি মোটামুটি সমান্তরাল খাতেই প্রবাহিত হয় ছ’য়ের দশকের মাঝামাঝি অবধি । এর কারণ অন্বেষণ করব পরের অধ্যায়ে । আপাতত এইটুকু বলা যাক যে সমাজ যেহেতু জ্যামিতির নিয়ম মানে না, তাই এই দুটি আপাতসমান্তরাল সাংগঠনিক ইতিহাসের ধারা দু’দশক ধরে কখনই একে অপরকে স্পর্শ করেনি তা নয় । সেটা আমরা দেখতে পাব ঠিকই । পরিসীমিত প্রবন্ধ-পরিসরের ওজরে আমরা এই ইতিহাস-পরিক্রমা দীর্ঘায়িতও করতে পারব না, তাই বিশদেও বলা হবে না সবকিছু । শুধু

মূল বিষয়গুলি ছুঁয়ে যাব ব্যাখ্যানে। অনুপুঙ্খ ইতিহাস জানতে হলে উৎসাহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন মহম্মদ সেলিমের গ্রন্থ "সংগ্রামী বীরভূম" যা মূলতঃ সরকারি বামেদের জয়গাথা হলেও একেবারে হেলা করার মত নয়।

কৃষক আন্দোলন

২৫শে জুন ১৯৪৯-এ ঘটে যাওয়া দামড়ার আন্দোলন ও পঞ্চশহিদের স্মৃতি আমাদের জানান দেয় যে বীরভূমে স্বাধীনতার আগে থেকেই গড়ে উঠতে শুরু করেছিল কৃষক সংগঠন। স্বাধীনতাসংগ্রামী বিপ্লবীদের বীরভূমে প্রত্যাবর্তনের হাত ধরে শুরু হয় এই সাংগঠনিক কাজ। এই জটিল গল্প সরল, সংক্ষিপ্ত ক'রে বলতে হবে তাই বলি এই বিপ্লবীরা মূলতঃ দুটি দলে নাম লেখান : একদল যায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিএলআই-এ (যার নাম বদলে পরে হয় আরসিপিআই), আরেক দল প্রত্যাশিত ভাবেই আশ্রয় নেয় সিপিআই-এ। দুই দলেরই লক্ষ্য এক : কৃষকদের মাঝে সংগঠন গড়ে তোলা। কাজে-কাজেই দুই দলের মাঝে রেষারেষি অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিছুদিন ঠাণ্ডা লড়াই চলার পর এই রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সর্বসমক্ষে এসে পড়ে ১৯৩৮-এ যখন গঠন করা হয় দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী বীরভূম জেলা কৃষক সমিতি : একটি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে এবং অন্যটি বঙ্কিম মুখার্জী ও নীহারেন্দু দত্তমজুমদার তত্ত্বাবধানে। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯শে এপ্রিল ১৯৩৮-এ দুবরাজপুরে আয়োজন করেন প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন। এর ঠিক তিন দিনের মধ্যে লাভপুরে পালটা আয়োজন করা হয় দ্বিতীয় জেলা কৃষক সম্মেলন এপ্রিল ২২ থেকে ২৩-এর মধ্যে। এই সম্মেলনটির উদ্যোক্তা অবশ্য নীহারেন্দু দত্তমজুমদার ও আবদুল মোমিন। ফাটল আরো প্রকট হয়। ১৯৩৯-এ নানুরে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় জেলা কৃষক সম্মেলন। আবদুল হালিমের মতে এইটিই জেলার প্রথম কৃষক সম্মেলন। এই দাবির পক্ষে সিপিআই ও পরবর্তিকালে সিপিআই(এম) নানা অগ্রহণীয় যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা করেছে; তবে তাদের এই যুক্তি খাড়া করার পেছনে বাস্তব কারণ হয়ত সুবিবেচক পাঠকের কাছে অধরা থাকবে না।

যাই হোক, আবদুল হালিমের হিসেবে "দ্বিতীয়"জেলা কৃষক সম্মেলন নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। ডি.আই.বি.ও. ফাইল সং. ৫৫/১৯৩৭ অনুসারে এই সম্মেলনটি হয়েছিল মল্লারপুরে ১১ই মে ১৯৪০এ। যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হয় ২৬-২৭ মে ১৯৪২এ চাঁদপুরে, ১৯৪৪এ রাজনগরে, ১৯৪৫এ সাঁইথিয়া থানার দেরিয়ারপুরে এবং ৮ই জুন ১৯৪৬ আহমদপুরে। এই কৃষক সম্মেলনগুলির বিস্তারিত বিবরণে আমরা যেতে পারব না। শুধু বলে রাখি, এই পুরো সময়টা ধরে আইবি ফাইল ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তার সাথে আমাদের জানাচ্ছে যে এই সম্মেলনগুলিতে মানুষের

অংশগ্রহণের সংখ্যা বাড়ছে এবং সাথেসাথে বাড়ছে তাদের কর্মসূচির সংগ্রামমুখিতা। ১৯৪৭ পেরিয়ে ১৯৪৯এর দামড়া তাই কোনো ব্যতিক্রমী মুহূর্ত নয়; একটি ধারাবাহিক আন্দোলন সংগঠনের ফল। মহম্মদ সেলিমের দেওয়া তথ্য থেকেও এর সমর্থন পাই আমরা : বীরভূম জেলার কৃষকসভার সদস্যসভার সদস্য সংখ্যা ১৯৪২-৪৩এ ৪,০০০ থেকে ১৯৫৪-৫৫এ বেড়ে দাঁড়ায় ৯,০০০এ; ১৯৫৫-৫৬এ সে সংখ্যা স্পর্শ করে ১০,৯০৯ এবং ১৯৬৬-৬৭তে তা পৌঁছয় ২১,১৪৭এ।

স্বাধীনতার এক বছর পর ১৯৪৮ সালে নেহরু সরকার বামপন্থী আন্দোলনগুলিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট্ পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করে। কিন্তু আন্দোলন স্তব্ধ হয় না। স্বাধীনতার প্রাক্-মুহূর্তে ও পরে ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯এর তেভাগা আন্দোলন ও অন্যান্য কৃষক আন্দোলন তার উজ্জ্বল উদাহরণ। বীরভূমের লাভপুর, সাঁইথিয়া, ময়ূরেশ্বর থানার কতকগুলি গ্রামে তেভাগা দাবির সঙ্গে জমিদার-মহাজনদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পরে কৃষক আন্দোলন ঠেকাতে মাঠে নামে সরকারি পুলিশ ও তাদের মদত দেয় জোতদার-জমিদারদের ব্যক্তিগত ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। খুন হয় সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত গোড়াইপুর গ্রামের আদিবাসী যুবক সুবল মার্ডি; দামড়ার পঞ্চশহিদের কথা তো আগেই শুনেছি। এ-ছাড়াও রয়েছে আরো অগণিত প্রাণঘাতী আক্রমণের ঘটনা যা আজও বীরভূমের লোকস্মৃতিতে জাগরূক। মনে আসে মহম্মদবাজার থানার যদু সরেনের ও অনাথ লোহারের কথা। ময়ূরেশ্বর থানার ষষ্ঠী লেটের কথা। এদের সকলের কথাই প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস ভুলে গেছে; এরা সবাই সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ। সে-কারণেই কি এই বিস্মৃতি?

পঞ্চাশের দশকে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলির মধ্যে বর্ধিত ক্যানল্ কর, বাধ্যতামূলক লেভির জুলুমের প্রতিবাদে সমাবেশ, বন্যাপীড়িত দুর্গত মানুষদের সাহায্যের দাবিতে আন্দোলন, ইত্যাদি। ১৯৫৯ সালে খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ, আইন অমান্য আন্দোলন, বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে সমাবেশ, বিক্ষোভ সঙ্ঘটিত হয়। সিউরি শহরে ব্যাপক সমাবেশ ও আইন অমান্য আন্দোলনে কৃষকনেতা টুরকু হাঁসদা, দেবেন রায় নেতৃত্ব দেন। কয়েকশত মানুষকে গ্রেপ্তার করে প্রশাসন। মনে রাখতে হবে এই বছরের ৩১শে আগষ্ট খাদ্যের দাবিতে কোলকাতার পথে জড়ো হওয়া হাজার মানুষের ভিড়ের ওপর গুলি চালায় বিধানচন্দ্র রায়ের পুলিশ; প্রাণ হারান ৮০ জন মানুষ। এই ঘটনার প্রতিবাদে বীরভূমেও পালিত হয় ধিক্কার দিবস।

ছ'য়ের দশকের গোড়াতেই (১৯৬২) ঘটে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ। সেই সুযোগে উগ্র জাতীয়তাবাদ উস্কে দিয়ে রাষ্ট্রশক্তি শুরু করে নির্বিচার ধরপাকড়। বাম দলগুলির উপর নেমে আসে রাষ্ট্রিক অত্যাচার। চীনের প্রতি বামদলগুলির কারো কারো নরম মনোভাবের কারণে জনসমর্থনেও হয়ত কিছুটা ভাটা পড়ে। আবার এই সময়েই ১৯৬৪তে আন্তর্জাতিক

মহাবিতর্কের অভিঘাতে ভেঙে যায় সিপিআই, জন্ম নেয় সিপিআই(এম) । এইসব কারণেই হয়ত ছ'য়ের দশকের প্রথম ভাগে আমরা দেখি কৃষক আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত— যা আবার পুনরুজ্জীবিত হবে ১৯৬৬র খাদ্য আন্দোলনের হাত ধরে। সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে দেখে নেওয়া যাক স্বাধীনতা-উত্তর বীরভূমে ছাত্র আন্দোলনের বিবর্ধনের ইতিহাস যা ১৯৬৬তে গিয়ে মিশতে শুরু করবে কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী ধারাটির সঙ্গে।

ছাত্র আন্দোলন

১৯৪২ সালে গড়ে ওঠে সোভিয়েত সুহৃদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগঠন। সেই বছরেরই ৭ ও ৮ জুলাই সিউড়িতে ওই সংগঠনের ডাকে প্রতিনিধি সম্মেলন ও প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু ও মুসলিম লীগ্ নেতা চৌধুরী সামসুল হুদা। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কম্যুনিষ্ট্ লীগ অফ্ ইণ্ডিয়ার মনোরঞ্জন দত্ত, হিন্দু মহাসভার হেমচন্দ্র দত্ত, এবং ১৯৩৪-এর বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত ও আন্দামান-ফেরত বিপ্লবী প্রদ্যোৎ রায়চৌধুরী (যার আরেক পরিচয় তিনি ভবিষ্যতের নকশালবাদী বিপ্লবী ও পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সীমান্ত কমিটির সদস্য ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরীর পিতা)। এই সময়ে বীরভূমে ছাত্র ফেডারেশন তৈরি হয়ে গেছে। কারণ ১৯৪২-এর ওই সোভিয়েত সুহৃদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলনের আহ্বায়কদের মধ্যে আমরা বীরভূম জেলা ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে নাম পাই নরহরি দত্ত, খয়রুল বাশার ও অতুল দেবের। তখন জেলায় মুসলিম ছাত্র লীগ্ও আছে। তারাও সম্মেলনের আহ্বায়ক, যেমন শাহ আহম্মদ, কলিম শরাফি (যিনি ১৯৪২-এই ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ও বর্তমানে বাংলাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী) ও আফি মাহমুদের।

চারের দশকের শুরু থেকেই কম্যুনিষ্ট্ ছাত্র আন্দোলনের একটি ধারা বীরভূমে দেখা যায়। সিউড়ির শরদীশ রায় এবং পূর্বোল্লিখিত প্রভাতকুসুম ঘোষ বর্দ্ধমানে পড়তে গিয়ে ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য হন এবং ১৯৪২ সালে বীরভূম জেলা কম্যুনিষ্ট্ পার্টির সদস্য হন। জেলায় ফিরে এসে এরা কম্যুনিষ্ট্ পার্টির কাজের সাথে ছাত্র সংগঠনের কাজেও লিপ্ত হন। মধ্য চল্লিশে সিউড়ি, রামপুরহাট এবং বোলপুরে ছাত্র ফেডারেশন তৈরি হয়ে গেছে। ছাত্রদের মধ্যে থেকে রামপুরহাটের ব্যোমকেশ রায় পার্টি সদস্য হন ১৯৪৪ সালে এবং সৌরীন্দ্র মুখার্জী (কুমকুম)— যার উল্লেখ আমরা দামড়ায় পেয়েছি— পার্টি সদস্য হন ১৯৪৭ সালে। বোলপুর শ্রীনিকেতনের ছাত্র সুনীল সেনও পার্টি সদস্য হন ১৯৪৭ সালে।পাঁচের দশকে বীরভূম জেলা ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্বে ছিলেন তিনি ও মধ্য পঞ্চাশে তিনি ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি হন।

পাঁচের দশকের শুরুতেই ১৯৫১-৫২ সালে বোলপুরে ছাত্র-যুবদের মধ্যে একটি পার্টি ইয়ুনিট্ গড়ে ওঠে। এই সময়েই এয়ারফোর্সের চাকরি খুইয়ে কম্যুনিষ্ট্ কর্মী অজিত সেন বোলপুর কোর্টে সামান্য চাকরি নিয়ে আসেন। তাঁর নেতৃত্বে তৈরি হয় বোলপুর ছাত্র-যুবদের পার্টি ইয়ুনিট্ এবং বোলপুরে তার অফিস্ খোলা হয়। ১৯৫৩ সালে বোলপুর কলেজে ভর্তি হন কৃষ্ণপদ সিংহরায় এবং মূলতঃ তাঁর নেতৃত্বে বোলপুর কলেজে ছাত্র ফেডারেশন ইয়ুনিট্ তৈরি হয়। সেই সময় কিন্তু বোলপুরে অনুশীলন দল থেকে সৃষ্টি হওয়া বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আরএস্পি-র শক্তি অনেক বেশি ও তার নেতৃত্বে রয়েছেন শান্তি সরকার, জননেতা হিসেবে তখন যার বিশাল প্রতিপত্তি। আরএস্পি-র নেতারা কিছুটা তত্ত্বগতভাবে এবং অনেকটা সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে সে-যুগের বোলপুরে কম্যুনিষ্ট্ কর্মীদের বাধা দিতেন।

এইরকম সময় ১৯৫২ সালে বোলপুরে হয় পার্টি কর্মী সম্মেলন। রাজ্য নেতৃত্ব থেকে আসেন সতীশ পাকড়াশী এবং ভবানী সেন। ১৯৫৪ সালে হয় ছাত্র ফেডারেশনের জেলা সম্মেলন। গোটা জেলা থেকে ছাত্ররা এসে জমায়েত হয়; প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রথিতযশাঃ রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৫সালে হয় যুব উৎসব যার প্রধান অতিথি হয়ে আসেন ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী। সেই বছরেই ইন্টরন্যাশনল্ ইয়ুনিয়ন অফ্ ষ্টুডেন্টস্-এর অষ্ট্রেলিয় সাধারণ সম্পাদক বোলপুরে আসেন ও বোলপুর কলেজের ছাত্রদের কাছে বক্তব্য রাখেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে উপহার দেয় রবি ঠাকুরের "গীতাঞ্জলি" ও আমার কুটিরের চামড়ার ব্যাগ। ১৯৫৬ সালে শান্তিনিকেতনে এলেন চীনের কম্যুনিষ্ট্ পার্টির অষ্টম সেন্ট্রাল কমিটির দুই সদস্য— চৌ এন-লাই এবং চ্যু-তে। ব্যাপক মানুষের সাথে বীরভূম জেলা বামপন্থী পার্টিগুলি, কম্যুনিষ্ট্ পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশন সংবর্ধনার জন্য জমায়েত হয়। চীনা ভাষায় সুস্বাগতম্ ব্যানার নিয়ে হাজির হয় কাতারে কাতারে ছাত্র। এইভাবে বোলপুর তখন কম্যুনিষ্ট্ ছাত্র আন্দোলনের জেলা-কেন্দ্রে চলে আসে। অন্যান্য বাম ধারাকে ছাপিয়ে ছাত্র ফেডারেশন এবং কম্যুনিষ্ট্ ধারা প্রবল হয়ে ওঠে। মেয়েরাও ছাত্র আন্দোলনে এগিয়ে আসেন— তাঁদের মধ্যে প্রতিভা মুখার্জী, মমতা চ্যাটার্জী প্রমুখের নাম পাওয়া যায়।

সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪২ সালে। এই কলেজেই ১৯৫১ সালে ভর্তি হন তেজারত হোসেন। মনে থাকবে ১৯৪৭-৪৮ সালে কম্যুনিষ্ট্ পার্টি বীরভূম জেলা ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিল সুনীল সেনের উপর। ১৯৪৮ সালে তেজারত হোসেন তখন সিউড়ি বেণীমাধব ইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র; ডাঙ্গালপাড়ায় থাকেন ও কংগ্রেসী সুভাষপন্থীদের পরিচালিত "নির্মল ভাইবোন সংঘ"-এ প্যারেড, পি.টি., ইতাদি করেন। এই সময়, অর্থাৎ ১৯৪৮-এই, সুনীল সেনের অনুগামী সিউড়ির চিফ্ ডিস্পেন্সরিতে কর্মরত বিনয় ব্যানার্জী তেজারত

হোসেনকে প্রথম প্রভাবিত করেন। সেই সময় লেখার কাগজ এবং কেরোসিন তেলের সমস্যা ছাত্রদের কাছে ছিল জ্বলন্ত সমস্যা। ইস্কুলে পিকেটিং করা, কমন্ রুমে মোহনদাস গাঁধির বাঁধান ছবি ঢিল ছুঁড়ে ভাঙা দিয়ে শুরু হয় হোসেনের কম্যুনিষ্ট্ আন্দোলনে এসে মেশার বৃত্তান্ত। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই হোসেন ছাত্র ফেডারেশন করতে থাকে। ১৯৫১ সালে তিনি সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে ঢোকেন ইন্টর্মিডিয়েট্ পড়তে। ১৯৫১-৫২ সালে তিনি জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক হন এবং প্রায় একই সাথে বীরভূম জেলা কম্যুনিষ্ট্ পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্র সংগঠন, রিক্সা ইয়্যুনিয়ন্, এবং বিড়ি ইয়্যুনিয়ন্ একই সাথে করতেন। তাই, প্রত্যাশিতভাবেই, পড়াশুনাটা হত কম। তাঁর ওই কলেজে পড়াকালীন সেখানে সংস্কৃত অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন মণি চক্রবর্ত্তী। তিনি গ্রামাঞ্চলে মার্ক্সবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার কাজ করতেন। এই সময়ে বীরভূমে পার্টি গড়ার ব্যাপারে মণি চক্রবর্ত্তীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তেজারত হোসেনের অন্য কিছু সহপাঠী পরবর্তীকালে দেশ-জোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন— যেমন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় অথবা ফুটবলার পি.কে. (প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী)। তাঁদের কথা না বলে তেজারত হোসেন ও অধ্যাপক মণি চক্রবর্ত্তীর কথা কিছুটা বিস্তারে বলার কারণ অবশ্য প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়; তবে তাছাড়াও এই কারণে যে এঁরাই হচ্ছেন সেই দু'জন ব্যাতিক্রমী মানুষ যারা শুধু একটি ধরনের বাম সংগঠনের (শিক্ষক বা ছাত্র সংগঠনের) কাজে সীমাবদ্ধ করেননি নিজেদের; কাজ করেছেন নানা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে; সংযোগসাধন করেছেন আপাতসমান্তরাল সাংগঠনিক নানান ধারার মাঝে।

১৯৫২ সালে কম্যুনিষ্ট্ পার্টি আবার আইনি হল। শরদীশ রায়, সুরেন ব্যানার্জীরা জেল থেকে ছাড়া পেলেন। সুরেন ব্যানার্জী বীরভূমে ফিরলে তিনি জেলা সম্পাদক হলেন এবং সিউড়ির জেলা পার্টি অফিসেই থাকতে আরম্ভ করলেন। মনে থাকবে এই সময় তেজারত হোসেন সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে রয়েছেন। আদপে তিনি তখন কলেজ ইয়্যুনিয়নের সহসম্পাদক। ১৯৫৪-এ তেজারত বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। বিভিন্ন কলেজে চেষ্টা করার পর ১৯৫৫ সালে তিনি বোলপুর কলেজে এসে ভর্তি হন ইন্টর্মিডিয়েট্ কোর্সে। একই বছর মানিক চট্টোরাজ এসে ভর্তি হন বোলপুর কলেজে। তেজারত-মানিক জুটি তৈরি হয়ে যায় কলেজে। ১৯৫৬ সালে বোলপুর কলেজের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তেজারত। পড়াশুনায় মনোনিবেশও করেন এইবার আর ফলও পান সাথে-সাথেই। ১৯৫৭ সালে মানিক ও তেজারত দু'জনেই ইন্টর্মিডিয়েট্ পাস করেন।

ততদিনে ১৯৫৫ সালে কৃষ্ণপদ সিংহরায় বোলপুর কলেজ থেকে বেরিয়ে বিশ্বভারতীতে বিএ-তে ভর্তি হয়েছেন। শান্তিনিকেতনে তখন ছাত্র ফেডারেশন ইয়্যুনিট্ আছে; কিন্তু ঘোষিত সংগঠন নেই। সকল মতাদর্শের ছাত্রছাত্রীরাই তখন

ছাত্র সম্মিলনীতে সামিল। সুনীল সেন তখনও আছেন চীনা ভবনে। ছাত্র ফেডারেশন ইয়্যুনিটে তখন আরো যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন : বিপ্রেন্দু চক্রবর্ত্তী, বিক্রমণ নায়ার, এবং এঁদের হেতমপুর থেকে এসে যোগ দেন দেবব্রত রায়। সিংহলের ছাত্র ছিল বিদ্যাশেখর ও ঈশ্বরমূর্তি। কাজের ধারা ছিল : মার্ক্সবাদ প্রচার; রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা; কম্যুনিষ্ট্ পত্রপত্রিকা বিক্রি করা, ইত্যাদি। সেই সময়ে বিশ্বভারতীতে "নিউ এজ্" বিক্রি হত প্রায় ৪০ কপি। ১৯৫৪ সালে ছাত্র ফেডারেশনের জেলা সম্মেলনে জেলা সম্পাদক হলেন তেজারত হোসেন এবং সহসম্পাদক কৃষ্ণপদ সিংহরায়। অর্থাৎ উভয়েই বোলপুরের। তেজারত-মানিক বোলপুরে আসার আগেই কৃষ্ণপদ সিংহরায় বোলপুর টেক্সট্বুক ব্যাঙ্ক তৈরি করেছিলেন, গরিব মহল্লায় নৈশ বিদ্যালয় চালাতেন, ছাত্র ফেডারেশনের পত্রিকা "ছাত্র অভিযান" ও কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বিক্রি করতেন। মাঝে মাঝে নানান সোভিয়েৎ ফিল্ম্ এনে দেখাতেন। তেজারত-মানিক এসে পড়ায় এর সাথে যুক্ত হল ছাত্রাবাস তৈরি আন্দোলন। ছাত্রাবাস সমস্যা দূর করতে ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তেজারত হোসেনরা ছাত্রদের জন্য বেসরকারি ছাত্রাবাস গঠন করেন। নাম দেন কস্মোপলিটন্ হোষ্টেল— হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ওই হোষ্টেলের দ্বার সবার জন্যই খোলা থাকত। তখন বোলপুর কলেজের ছাত্র ইয়্যুনিয়নের কোনো সংবিধান ছিল না। তেজারতই সংবিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হন এবং ১৯৫৬ সালে ওই সংবিধান রচিত হয়। তেজারতের সময়েই আবার হেল্থ্ হোম আন্দোলনের সূচনা হয়।

তবে ১৯৫৭ সালে তেজারত ও মানিক বোলপুর ত্যাগ ক'রে বিএ পড়তে গিয়ে কিছুদিন আসানসোল কলেজে এবং কিছুদিন হেতমপুর কলেজে ক্লাস্ করেন। চারের দশকের শুরু থেকে হেতমপুর-দুবরাজপুর অঞ্চলে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরসিপিআই-এর প্রতাপ। এই ধারার রাজনীতি ওখানে পরিচর্যা করতেন অমূল্য চ্যাটার্জী, নেপাল মজুমদাররা; পরবর্তীকালে ৫০-এর দশকের শুরু থেকে ওখানে একই ধারায় ছাত্র সংগঠন করতে উদ্যোগ নেন সুবল রজক, কবি আশানন্দ চট্টোরাজ, মহাদেব বাউড়ি প্রমুখ। চল্লিশের প্রথম দিকে এখানে ছাত্র ছিল কলিম শরাফি। মধ্য পঞ্চাশে সক্রিয় ছাত্র সংগঠন তৈরির ভূমিকা নেন দেবব্রত রায় (যিনি পরে বিশ্বভারতী চলে যান)। এরপর পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে সিপিআই ধারার রাজনীতি নিয়ে হেতমপুর এলেন তেজারত, মানিক, কানন দত্তমুদি। এঁরাও হেতমপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কিছুদিন এই দায়িত্ব পালন করেন অলোক মুখার্জী। হেতমপুর কলেজে মধ্য পঞ্চাশে অধ্যাপনা করতেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত; তিনিও আরসিপিআই ধারার লোক। যাই হোক, ১৯৫৭ সালে তেজারত-মানিক হেতমপুর কলেজে আসার পর, কানন দত্তমুদি, অনিল আচার্যদের সহায়তায় হেতমপুরে ছাত্র ফেডারেশন সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আসলে তখন তো কলেজগুলির

নির্বাচন সংগঠনের নামে হ'ত না । কাজেই সাংগঠনিক ধারাবাহিকতার প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র বজায় রাখার খুব একটা প্রয়োজনও ছিল না । তাই কলেজ ইয়্যুনিয়ন্ কাদের, সেটা ওপর থেকে বোঝাও যেত না । কখনো বামধারার ছেলে-মেয়েরা, কখনো অন্য কোন ধারার ছেলে-মেয়েরা নেতৃত্বে উঠে আসত । তবে তেজারত-মানিক এখানে শুধু ছাত্র সংগঠনেই নিজেদের সীমিত রাখেনি; বিড়ি মজদুর ইয়্যুনিয়ন্, ইসলামপুরকে কেন্দ্র ক'রে বিড়ি-মজদুর আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে মেতে ওঠেন তাঁরা এবং ডিস্কলেজিয়েট্ হয়ে পরীক্ষা না দিয়ে ফেরত চলে আসেন । তেজারত বোলপুরে ও মানিক কোলকাতার স্কটিশ চার্চে ভর্তি হন ।

৬০-এর দশকের শুরু থেকে বীরভূমে নেমে আসে এক দমবন্ধ-করা শূন্যতা । ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে তেজারত হোসেন গ্রেপ্তার হলেন মহম্মদবাজারের একটি জমায়েত থেকে । বোলপুরেও মিছিল হল । কৃষ্ণপদ সিংহরায় ও অন্যেরা ডাকবাংলো মাঠে ৩১শে আগষ্ট রাতেই বানালেন শহিদ বেদী । তবে ছাত্ররাজনীতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম মেনে তিনিও এমএ পাস করে গেলেন ১৯৬০ সালে । ততদিনে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এমএ পড়তে কোলকাতা চলে গেলেন তেজারত হোসেন । সুনীল সেন ইতিমধ্যে চলে গেছেন সুদূর জার্মানি । অজিত সেন চলে গেছেন কোলকাতা । বোলপুর কলেজে তখনও ছাত্র ফেডারেশন ইয়্যুনিট্ আছে বটে (এবং তার নেতৃত্বে আছেন জয় চট্টোপাধ্যায়, বিভুদান মুখার্জীরা) । তবে ১৯৬২তে পুরন্দরপুরে একটি ইস্কুলে চাকরি পেয়ে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন স্বয়ং কৃষ্ণপদ সিংহরায় । বোলপুরে ছাত্র আন্দোলনে তখন ভাটার টান । রামপুরহাটেও একই ছবি । ১৯৫৪/৫৫ সালেই সৌরীন্দ্র মুখার্জী ও অশোক মুখার্জী কোলকাতা চলে যান এবং কম্যুনিষ্ট্ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন । ছ'য়ের দশকের প্রথম থেকেই রামপুরহাট ছাত্র আন্দোলনে তাই কেউ-নেই শূন্যতা । শুধু সিউড়িতে কিছুটা হলেও কম্যুনিষ্ট্ ছাত্র আন্দোলনের ধারাটা অব্যাহত থাকে ছ'য়ের দশকের । তবে তাও ক্ষীণ ভাবেই । এর কারণ এমএ পাস ক'রে জেলা সদরে প্রত্যাবর্তন তেজারত হোসেনের ১৯৬১র শেষে । ১৯৬২তেই জেলা পার্টি মুখপত্র "ধূসর মাটি" প্রথম প্রকাশিত হয় শরদীশ রায়ের সম্পাদনায় । তার প্রকাশক তেজারত হোসেন । ১৯৬৩র থেকে ক্রমাগত আন্তঃপার্টি বিতর্ক চালানো এবং ১৯৬৪তে সিপিআই(এম) গঠনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে তেজারত হোসেন । ১৯৬৫ সালে তেজারত গ্রেপ্তার হন ও ১৯৬৬ সালের পর জেলার কম্যুনিষ্ট্ আন্দোলনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় । যদিও আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব তিনি জেলার নকশালদের প্রতি সহানুভূতিশীল সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেন সত্তরোন্মুখ বীরভূমে ।

"জতুগৃহের পিঙ্গল আভায়"

পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই সময় থেকেই দেখি কম্যুনিষ্ট্ আন্দোলনের দুটি আপাতসমান্তরাল ধারা এসে মিশছে একই স্রোতে। বোলপুরে দেখি বিশাল ছাত্র-কৃষক যৌথ সমাবেশ। সেই জমায়েত থেকে গ্রেপ্তার হন কৃষ্ণপদ সিংহরায়— এবং এতদিন পরেও ছাত্রনেতা হিসেবে। বোলপুর কলেজ এবং সব ইস্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট পালন ক'রে মিছিল নিয়ে আদালত চত্বরে আসে। আসপাশের বিষ্ণুখণ্ডা, সাত্তোর প্রভৃতি গ্রাম থেকে কৃষকরা মিছিল নিয়ে আসেন। পুলিশ লাঠি চালায় এবং ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। বীরভূমের অন্যত্রও আন্দোলন, পুলিশের সাথে কৃষক ও ছাত্রদের খণ্ডযুদ্ধ এবং নির্বিচারে গ্রেপ্তারের চিত্রটা অনুরূপ। তবে এই আন্দোলন মূলতঃ বাম দলগুলির নেতৃত্বে আন্দোলন— ছাত্রদের নিজস্ব উদ্যোগে স্বাধীন আন্দোলন নয়। তবু মানতেই হয় যে ছাত্র-কৃষক বিচ্ছিন্নতার শেষের শুরু ১৯৬৬র খাদ্য আন্দোলনের পথ ধরেই, হোক না তা যতই সরকারি বাম পরিচালনায়। এই বিচ্ছিন্নতা কেটে যেতে যেতেই পরের বছর ভারতে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ এবং ছাত্র-কৃষক সংশ্রয়ে বীরভূমে উৎপদ্যমান বৈপ্লবিক চেতনার ভিত্তি নির্মাণ। সেখান থেকে বিস্ফোরক অভিযাত্রা বীরভূম '৭০-৭১-এর উদ্দেশে।

বীরভূম '৬৭-৭১ : "অন্ধকার প্রসব করে খণ্ড খণ্ড হীরের শিশুদের"

এ কথা অনেকেই জানেন যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রপাত ছাত্র-যুবকদের হাত ধরে হয়নি। দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়াতে যে জঙ্গী আন্দোলনের সূচনা হয় তার নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিষ্ট্ কর্মী-সংগঠকেরা যাদের পাঁচের ও ছ'য়ের দশক ধরে গ্রামে থেকে কৃষকদের মাঝে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই অভ্যুত্থান। খোকন মজুমদারের বিবৃতি থেকে পরিষ্কার হয় বিষয়টি : কানু সান্ন্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, কদম মল্লিক, খুদন মল্লিক, কেশব সরকার, মণিলাল সিং, তিনি স্বয়ং ও অন্যান্য আরো অনেকেই ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তরাই কৃষক আন্দোলনে। চারু মজুমদার এসেছিলেন ১৯৪৬-এর তেভাগা আন্দোলন থেকে। এই কৃষক আন্দোলন ও চা-বাগানের শ্রমিক আন্দোলন গোড়া থেকেই সশস্ত্র সংঘর্ষের পথ বেছে নিয়েছিল জোতদার ও চা-বাগানের মালিকদের বিরুদ্ধে। দু'দশক ধরে তাই বার বার জেলে গেছেন নেতারা এবং কৃষককর্মীরা। পাঁচ পেরিয়ে ছ'য়ের দশকে প্রবেশ করেই তাঁদের লড়তে হয়েছে ১৯৬২'র ভারত-চীন যুদ্ধ সঞ্জাত উগ্র জাতীয়তাবাদের সাথে, ১৯৬৩র সেপ্টেম্বর থেকে তাঁদের পক্ষ নিতে হয়েছে মাও-ক্রুশ্চেভ আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কে, ১৯৬৪তে এসে তাঁদের অনেকেই সিপিআই ছেড়ে চলে এসেছেন সিপিআই(এম)-এ, ১৯৬৫তে সাক্ষী থেকেছেন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ও উগ্র জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের, ১৯৬৬র খাদ্য আন্দোলনে জেল খেটেছেন তাঁরা। তারপর ১৯৬৭। নকশালবাড়ির পতাকা তাই এই পোড়-খাওয়া নেতৃত্বের হাতেই।

বীরভূমেও চার, পাঁচ, ছ'য়ের দশক ধরে গড়ে উঠেছিল বামপন্থী কৃষক আন্দোলন— এর ইতিহাস কিছুটা আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি। তবে যখন নকশালবাড়ির উত্তুরে হাওয়া এসে ঝাপ্‌টা দিল দক্ষিণে তখন বীরভূমে সেই বৈপ্লবিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব মূলতঃ ছাত্র-যুব সমাজ কাঁধে তুলে নেয়। এর মানে এই নয় যে এতদিনের কৃষক আন্দোলনের কোন প্রভাবই আর রইল না। কৃষক-সমাজের নানা শ্রেণী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তার মদতপুষ্ট শোষকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে এই পূর্বসূরি আন্দোলনের আবহেই। বরঞ্চ বলা যেতে পারে বীরভূমে নকশাল আন্দোলনের *নেতৃত্ব* উঠে আসে প্রধানত ছাত্র-যুবদের মধ্য থেকে; এদের পরিচালনায় রাষ্ট্রশক্তির সাথে সংঘর্ষের রূপটা নতুন প্রাগ্রসর মাত্রা পায় ১৯৬৭-৭১-এর বীরভূমে। এই অর্থে অবশ্যই নকশাল আন্দোলন একটি বিভাজিকা; তবে সমস্ত বিভাজিকার মতই এইটির মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত রয়েছে ধারাবাহিকতার স্রোত, তা আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে যতই ক্ষীণ মনে হোক না কেন। আবার, ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরীর মতে, ছাত্র-যুবদের সেই অংশটাই বীরভূমে নকশাল আন্দোলনের সূচনা ও ব্যাপ্তি ঘটায় যাদের ১৯৬৭ পূর্ববর্তী কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতার প্রত্যক্ষ ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। অধুনা প্রকাশিত (এপ্রিল ২০১৭-এ) "নকশাল আন্দোলন: মানুষের ভূমিকা" বইটিতে শৈলেন মিশ্রও এই বিবেচনা সমর্থন করেছেন। এ কথা ঠিকই যে নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক মতাদর্শ বীরভূম জেলার কমিউনিষ্ট শিবিরে কোনো বড় আলোড়ন আনতে পারেনি এবং, তেজারত হোসেনের 'সহানুভূতিপূর্ণ সমর্থন' ছাড়া, তৎকালীন জেলা নেতৃত্বের কাউকেই নকশাল আন্দোলন টেনে আনেনি। তবে মনে রাখতে হবে, হ্যাঁ, ধারাবাহিকতার *প্রত্যক্ষ* ইতিহাস হয়ত খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই যুব-ছাত্র নেতারা অনেকেই তাদের মার্ক্সবাদের প্রথম পাঠ পেয়েছেন অগ্রজ প্রজন্মের কাছে— পরিবার-পরিজন, পিতৃতুল্য মাষ্টারমশাই, অগ্রজপ্রতিম বন্ধুদের কাছে। তাঁদের কেউ কেউ তৎকালীন বামপন্থী আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে হতাশাও ব্যক্ত করেছেন কখনো হয়ত বা। এমন উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে ভারতজ্যোতিরই বইগুলির পাতায় পাতায়— যেই বইগুলি নিঃসন্দেহে ইতিহাস ও আত্মকথনের এক অনবদ্য মিশেল। একটা আন্তঃবিদ্রোহের ভিত কি একেবারেই তৈরি হয়নি? ভারতজ্যোতিই তো, তাঁর নিজের বয়ান অনুসারে, এই প্রক্রিয়ার এক অপ্রত্যাখ্যেয় উদাহরণ।

আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কে যেই সকল ভারতীয় বামপন্থীরা চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির অবস্থানকে সমর্থন করেন তাঁদেরই বেশির ভাগ পরবর্তীতে রাজ্যব্যাপী নকশালবাড়ি আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অন্যান্য জেলাগুলির মত বীরভূমেও এই প্রবণতাই দেখা যায়। সে বিষয়ে আসব। তার আগে এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক কিভাবে রাজ্যে ও দেশে এই স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক মুহূর্তটিকে ক্রমে বাঁধার চেষ্টা করা হয় সাংগঠনিকতার নিগড়ে।

পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠে "নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি"। এই কমিটির ১২-১৩ নভেম্বর ১৯৬৭'র সর্বভারতীয় সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় "অল্ ইণ্ডিয়া কোঅর্ডিনেশন্ কমিটি অফ্ রেভল্যুসনরিস্ অফ দ্য সিপিআই(এম)" [এ.আই.সি.সি.আর অফ্ দ্য সিপিআই(এম)] গঠন করার। একটি আপাতকালীন কমিটি তৈরি করা হয় বিপ্লবীদের একত্র করে ক্রমে একটি বিপ্লবী পার্টি গঠনের উদ্দেশ্যে।

এই কোঅর্ডিনেশন্ কমিটির কর্মনীতির অংশ ছিল মার্ক্সিজ্ম্, লেনিনিজ্ম্ ও মাও ৎসে-তুং থট্-এর প্রচার; এই ভিত্তিতে কম্যুনিষ্ট্ বিপ্লবীদের সংহতকরণ; সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই; দেশের নানা প্রান্তে হতে থাকা বৈপ্লবিক সংগ্রামগুলির সহযোজন ও তীব্রতাবর্ধন (বিশেষত সেই সব আন্দোলনগুলির যেগুলির চরিত্র নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের ধাঁচের); এবং বৈপ্লবিক কর্মসূচি ও কৌশলগত "লাইন" নিরূপণ। ১৯৬৮'র মে মাসে, নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীর প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হয় কোঅর্ডিনেশন্ কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন। এই অধিবেশনে পুরান কোঅর্ডিনেশন্ কমিটির নাম বদলে রাখা হল "অল্ ইণ্ডিয়া কোঅর্ডিনেশন্ কমিটি অফ্ কম্যুনিষ্ট্ রেভল্যুসনরিস্" [এ.আই.সি.সি.সি.আর, অথবা সারা ভারত কম্যুনিষ্ট্ বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি] যার আহ্বায়ক হলেন সুশীতল রায়চৌধুরী। বৈপ্লবিক "লাইন"-এর প্রচার বাড়াতে এর কিছু মাস আগে কম্যুনিষ্ট্ বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত নেন রাজনৈতিক পত্রপত্রিকা প্রকাশ করার। সুনীতি কুমার ঘোষের সম্পাদনায় "লিবরেশন"-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১১, ১৯৬৭। বাংলায় প্রকাশ পায় "দেশব্রতী"। লিবরেশনের সর্বোচ্চ কাটতি এক সময়ে ২,৫০০ ছুঁয়েছিল আর দেশব্রতীর ৪০,০০০।

ইতিমধ্যে ১৯৬৭-১৯৬৮ জুড়ে নকশালবাড়ির সংগ্রামী আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে; এবং উত্তর অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকাকুলম জেলায় তা প্রবল আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯-এ এ.আই.সি.সি.সি.আর-এর সভায় পার্টি স্থাপন করার প্রস্তাব গৃহীত হল। এপ্রিল ১৯-২২, ১৯৬৯-এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এ.আই.সি.সি.সি.আর এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও লেনিনের জন্মশতবার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠা হয় কম্যুনিষ্ট্ পার্টি অফ্ ইণ্ডিয়া (মার্ক্সিষ্ট্-লেনিনিষ্ট্), বা সিপিআই(এম-এল)। পার্টি সংবিধানের মুসাবিদা করার জন্য ও পার্টি কংগ্রেসের আয়োজন করতে গঠন করা হয় আবার একটি কোঅর্ডিনেশন্ কমিটি। ১ মে, ১৯৬৯, কোলকাতার মনুমেন্টের ময়দানে কানু সান্যাল সিপিআই(এম-এল) গঠনের কথা ঘোষণা করেন। ওই সভার সভাপতিত্ব করেন অসিত সেন।

নকশালবাড়ির উদাহরণে উদ্বুদ্ধ সকলেই কিন্তু যোগ দেননি সিপিআই(এম-এল)-এ; যারা দিয়েছিলেন তাঁদেরও অনেকে আবার বেশ কিছুদিন চিন্তা-বিবেচনা করে তবেই যোগদান করেছিলেন। যেমন নতুন পার্টিতে যোগদান করেনি পশ্চিমবঙ্গের "দক্ষিণ দেশ" গোষ্ঠী এবং অন্ধ্র প্রদেশ কোঅর্ডিনেশন্ কমিটি অফ্ কম্যুনিষ্ট্ রেভল্যুসনরিস্ (এ.পি.সি.সি.সি.আর)। "দক্ষিণ দেশ" গোষ্ঠীর কাছে এই চটজলদি পার্টি গঠন ও তা গঠনের প্রক্রিয়া সমর্থনযোগ্য মনে হয়নি আর এ.পি.সি.সি.সি.আর-এর তো সিপিআই(এম-এল)-এর রাজনৈতিক "লাইন"-টিকেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। "দক্ষিণ দেশ" গোষ্ঠী ১৯৬৯ সালের ২০ অক্টোবর স্বতন্ত্র একটি কম্যুনিষ্ট্ বিপ্লবী সংগঠন "মাওবাদী কম্যুনিষ্ট্ কেন্দ্র" তৈরি করে। এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন কানাই চ্যাটার্জী, অমূল্য সেন প্রমুখ।

সে যাই হোক, ১৯৬৯-এর মাঝামাঝি সময় থেকে প্রশাসন আধাসামরিক বাহিনীর সাহায্যে ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ করে সমস্ত তথাকথিত "উপদ্রুত" অঞ্চলে। শীঘ্রই সিপিআই(এম-এল)-এর নেতৃবৃন্দকে আত্মগোপন করতে হয় এবং গোপনে থেকেই চালাতে হয় সাংগঠনিক কাজ। ১৯৭০ সালের এপ্রিলে রেড্ হয় লিবরেশন্ ও দেশব্রতীর দফতর এবং পুরোদমে শুরু হয় কম্যুনিষ্ট্ বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন করার সরকারি অভিযান। ১৯৭০ সালের ১৫-১৬ মে কোলকাতার গার্ডেন রিচের রেল কলোনির একটি বাড়ির দোতলায় অনুষ্ঠিত হয় সিপিআই(এম-এল)-এর "অষ্টম" কংগ্রেস (সিপিআইএম-এর সপ্তম কংগ্রেসের সাথে ধারাবাহিকতা রেখে)। অত্যন্ত গোপনে চলে এই কংগ্রেসের কাজ। নির্বাচিত হয় ২১ সদস্যের সেন্ট্রাল কমিটি যার সাধারণ সম্পাদক হন চারু মজুমদার। তৈরি হয় ন'জন সদস্যের পলিট্‌বুরো যাতে চারু মজুমদার ছাড়া স্থান পান সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, সৌরেন বসু (সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ), সত্যনারায়ণ সিং (বিহার), শিবকুমার মিশ্র (উত্তর প্রদেশ), রাম পিয়ারা শরাফ্ (জম্মু-কাশ্মীর), ও আপ্পু (তামিল নাড়ু)। অন্ধ্র প্রদেশের জন্য সংরক্ষিত আসন দুটি শেষ অবধি শূন্যই থেকে যায়।

দেশ ও রাজ্যস্তরের এই ঘটনাক্রমের সাথে তাল মিলিয়ে বীরভূমেও চলে সংগঠন তৈরির কাজ। সমন্বয় কমিটি গড়ে ওঠার কিছুদিন পর বীরভূমের বিপ্লবীরা এই জেলাতেও এ.আই.সি.সি.সি.আর-এর বীরভূম জেলা কমিটি গঠন করেন যার সম্পাদক হন দীপঙ্কর রায়। দ্বিতীয় আরেকটি কম্যুনিষ্ট্ বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি জেলায় ছিল। এই কমিটির নেতারা এ.আই.সি.সি.সি.আর-এর সঙ্গে যুক্ত হননি। সিপিআই(এম-এল) গঠন হলে পরে বীরভূমে তার জেলা কমিটি গঠন হয়; জেলার প্রথম সম্পাদক ছিলেন সুশান্ত ব্যানার্জী। তবে মনে রাখা দরকার যে অনেক কম্যুনিষ্ট্ বিপ্লবী চারু মজুমদারের সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নিতে গোড়ায় দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন— যেমন ছিলেন ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী। কিন্তু বৃহত্তর আন্দোলনের স্বার্থে

তাঁরা এই তত্ত্ব কিছুটা অনিচ্ছাভরেই মেনে নেন ও সিপিআই(এম-এল)-এর জেলা কমিটির সাথে যুক্ত হন। আবার পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সমন্বয় কমিটিটি প্রথমে সিপিআই(এম-এল)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়নি; পরে ১৯৭০ সালে তাঁরাও সিপিআই(এম-এল)-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং সেই থেকে শুরু হল বীরভূমের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

সিপিআই(এম-এল) গঠনের পর থেকে পার্টির চারপাশে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে ছাত্রযুব সম্প্রদায়, ধীরে ধীরে জড়ো হতে লাগলেন। শৈলেন মিশ্র আমাদের জানাচ্ছেন যে আরও কিছু পরে বীরভূম-সাঁওতাল পরগনা-মুর্শিদাবাদ নিয়ে আঞ্চলিক কমিটি গড়ে ওঠে— ওই কমিটির সম্পাদক ছিলেন শ্যামসুন্দর বোস। অগ্রণী কর্মীরা জেলার শহরে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন মতাদর্শগত প্রচার অভিযান চালাতে। ছোট ছোট সভা ক'রে ও প্রচারপত্র বিলি ক'রে বিপ্লবী রাজনীতি জনগণের কাছে নিয়ে যেতে শুরু করেন তাঁরা। এই জায়মান বিপ্লবচেতনার জমির উপর দাঁড়িয়েই বীরভূমে প্রকাশ পায় আন্দোলনের মূল অঙ্ক— যা সূচিত হয় চারু মজুমদারের খতমের রাজনীতি দিয়ে। এই সময়ে পার্টির মধ্যে দুই লাইনের লড়াই শুরু হয়। সুশীতল রায়চৌধুরী পূর্ণ ছদ্মনামে তদানীন্তন রাজনীতির কিছু বিষয় নিয়ে বিরোধী মত প্রকাশ ক'রে একটি দলিল দেন। এই দলিল বীরভূমের কমরেডদের কাছে পৌঁছেওছিল। কিন্তু ততদিনে পার্টি কংগ্রেসে চারু মজুমদারের কর্তৃত্ব এবং খতম অভিযানের "লাইন" প্রতিষ্ঠিত (যা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী জেলা নেতৃত্বের কাছে হয়ত অনেক বেশি দুঃসাহসী এবং— সেই কারণে— আকর্ষক লেগে থাকবে)। সেই রাজনীতির ব্যাপক প্রভাব এবং আবেগের কারণে বীরভূমের বিপ্লবীরা কমরেড পূর্ণর বক্তব্য গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। একই ভাবে কমরেড সত্যনারায়ণ সিং-এর দলিলকে সংশোধনবাদী ও ধনী কৃষকের পক্ষে ওকালতি মনে করা হয়েছিল। তাই জারি রইল : খতম।

বীরভূমে গণমুক্তি ফৌজ গড়ে ওঠেনি ঠিকই। তবে এ কথা সত্যি যে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে গেরিলা স্কোয়াড বন্দুক-রাইফেল নিয়ে মিছিল করেছে। তাতে বিপ্লবী জনগণ অংশগ্রহণ করেছে। এই মোবাইল স্কোয়াডগুলি বন্দুক-রাইফেল ছিনতাই করেছে। জোতদার-সুদখোরদের বিচার করে শাস্তির বিধান দিয়েছে। জোতদারদের জমি কেড়ে নিয়ে জনগণের মধ্যে বিলি করেছে। যে কোন আন্দোলনের ব্যাপকতা ও জনসমর্থনের মাপকাঠি নিশ্চিত জানা যায় সফল কার্যক্রমের প্রামাণ্য তথ্যাবলী দেখে, তার সপ্রযত্ন বীক্ষণে। বীরভূম '৭০-৭১-এর এমন তথ্য যত্নে সংগ্রহ ক'রে, তালিকাভুক্ত ক'রে পেশ করেছেন ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী তাঁর "সাতচল্লিশ থেকে সত্তর এবং আগে পরে" গ্রন্থে। সেখান থেকে আমরা পাই যারা সিপিআই(এম-এল)-এর হাতে খতম হয়েছিলেন তাদের নাম এবং মৃত্যুর স্থান ও তারিখ। আরো পাই জেলার বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগের খতিয়ান; পুলিশ ও সশস্ত্রবাহিনীর উপর আক্রমণ এবং বন্দুক দখলের ফর্দ। অপর পক্ষে আমরা পাই কম

পক্ষে ৫৫ জনের নাম যারা পুলিশ এবং পুলিশের মদতে খুন হন নকশাল হিসেবে। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য মানুষের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা যাদের বিনা বিচারে/ বিচারাধীন অবস্থায় পাশবিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে পুলিশের হাতে ও হেফাজতে। এই তথ্যাবলী অত্যন্ত গুরুত্ববহ; এই তথ্যাবলী আমাদের সচেতন করে, নিরন্তর সজাগ রাখে। তবে একটি আন্দোলনের ব্যাপকতা ও জনসমর্থনের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেষ্টা তার সংগ্রামী ভাষা যা বীরভূম '৭১-এ অভিব্যক্ত হয়েছিল রাজনৈতিক লোকগানে। শৈলেন মিশ্রর বই থেকে দুটি উদাহরণ দেওয়ার লোভ সংবরণ করা গেল না।

৭১-এর গোড়ায় বিপ্লবী জনগণের মুখে মুখে শোনা যেত এই গান :

রাইফেল তুলে বলছে যারা
আয় রে এ-দেশ মুক্ত করি
ওরা ভারতের মহান জনতা
জননী তাদের নকশালবাড়ি।

৭১-এর অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে যে গানটি সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল :

চলেছে কৃষকের গণ ফৌজ
জনযুদ্ধের ডাক শুনি
শোষিত মানুষের আশা হোক
ক্ষমতা দখলের ভাষা।
মহান চীনের বীর জনগণ
বহু বছর ধরে
গড়ে তুলেছেন নয়া চীন এক
এ পথে লড়াই করে।

বীরভূমের সংগ্রাম প্রকৃতার্থে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ বলতে যা বোঝায়, তাই। কারণ ১৯৭১-এ নকশালপন্থী আন্দোলন দমন করার জন্য জেলার পুলিশের সঙ্গে যোগ দেয় : ০১ ব্যাটেলিয়ন ফোর্থ রায়পুর ইনফেন্ট্রি; ০৫ কোম্পানি

সি.আর.পি.এফ; ০২ কোম্পানি স্টেট আর্ম্ড্ পুলিশ; ০২ প্ল্যাটুন ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়র রাইফেল্স্; ০২ কোম্পানি ন্যাশনল্ ভলন্টিয়র ফোর্স; ০২ কোম্পানি সৌরাষ্ট্র রিজর্ভ পুলিশ; অর্থাৎ ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ সৈন্য। এই অভিযান শুরু হয় ০১ জুলাই ১৯৭১ এবং চলে ১৫ অগাষ্ট ১৯৭১ অবধি। কোড নেম অপরেশন্ ষ্টিপ্ল্চেস্।

তবে লাভ বিশেষ হয় না। এই ৪৫-দিন ব্যাপী অভিযানে ৫০০ লোককে গ্রেপ্তার করে সেনাবাহিনী, যার মধ্যে ১০০ জন নকশাল। তবে ওঁরা যোদ্ধা ছিলেন না, সমর্থক ছিলেন, সহানুভূতিশীল ছিলেন। সেনাবাহিনী একজনও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি যার সঙ্গে কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা সাধারণ অস্ত্র ছিল। সে যা পেরেছে তা হল তিনটি থানার তিনজন সাধারণ নিরস্ত্র সমর্থককে গুলি করে মারতে; সিউড়ি থানার গজালপুর মাঝিপাড়ায় কয়েক হাজার সেনা মিলে তিনজন সিপিআই(এম-এল) কর্মীকে গুলি করে মারতে, যাদের নাম রঘুনাথ সেনগুপ্ত, লক্ষ্মণ মাল ও গোপাল কিসকু; এবং "কৃতিত্বের" মধ্যে আছে ১৪ই জুলাই ১৯৭১-এ মাধাইপুর থেকে বীরভূম জেলা নেতৃত্বের তিনজনকে গ্রেপ্তার করা— আলোক মুখার্জী, বীরেন ঘোষ এবং সুদেব বিশ্বাস। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। যার পোশাকী নাম অপরেশন্ ষ্টিপ্ল্চেস্। অন্যদিকে এত রাষ্ট্রবাহিনীর উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও সিপিআই(এম-এল) কর্মী ও জনগণের মনোবলে একটুও ভাটা পড়েনি। বোলপুর-সিউড়ি-সহ জেলার সর্বত্র পার্টির লোকজন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় বীরভূম সফরে বোলপুরে এলে তার কন্ভয়ে বোমা ও কক্টেল মেরে তাকে আক্ষরিক অর্থেই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। লক্ষ্মণ-গোপাল-রঘুনাথ হত্যার প্রতিবাদে সিপিআই(এম-এল)-এর আহ্বানে অভূতপূর্ব সফল হরতাল করেছে সিউড়ি শহর ২০ অগাষ্ট ১৯৭১-এ।

সেনাবাহিনীর চোখরাঙানিতে না দমলেও অবশ্য বীরভূমী নকশালপন্থীরা শেষে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার কারণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রযন্ত্রের অক্লান্ত নিষ্পেষ নয়। রাষ্ট্রসন্ত্রাসের শনি প্রবেশ করতে পারে নকশাল আন্দোলনের খতম নীতি ও স্থায়ী তৃণমূল-সংগঠন তৈরির প্রতি বিমুখতার ছিদ্র পথেই। ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরীর অননুকরনীয় ভাষায় : "হেরে যাওয়ার কারণ নিহিত ছিল তার [বীরভূমের আন্দোলনের] নেতৃত্বহীনতায়, রণনীতি ও রণকৌশলের আবোল তাবোল বক্তৃমায় এবং যত্রতত্র মাওকে টুকলি করায়।" খতমের পথে শ্রেণীশত্রুবিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার পথে অনবরত সাধারণ মানুষ কতদিন টিকে থাকতে পারে? তা ছাড়াও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দেখায় সমস্ত দেশ ও কালে হিংসা একটা পর্যায়ের পরে আত্ম-পরের, শত্রু-মিত্রের বিভেদ মানে না— তা হয়ে ওঠে দিশাহীন, উদ্দাম, সর্বগ্রাসী এবং সে-কারণেই আত্মঘাতী। কাজে-কাজেই ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হলেই আসে নকশালদের সাথে দরিদ্র জনতার বিচ্ছিন্নতা। সেই হল শেষের শুরু। আমার মত

একজন ইতিহাসের ছাত্রের অবশ্য কাজ বীরভূমে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঠিক-ভুল বিচার করা কখনই নয় (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখি এ-ধরনের তর্কাতর্কি আসলে সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত)। আমাদের চোখে যা ধরা পড়ে তা হল একটি সংগ্রামী মুহূর্ত হিসেবে এই আন্দোলনের সর্বজনস্বীকৃত প্রভাব যা আজও অব্যাহত রয়েছে। তাই আমাদের মনে যে প্রশ্ন জাগে, বা জাগা উচিৎ, তা হল : কি ছিল এই আন্দোলনের আবেদনে যা বছর বছর ধরে, এবং আজও, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে, পারছে নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে? দেশ ও রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন প্রযোজ্য ঠিকই। তবে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যোগ্যতা বা দুঃসাহস আমার নেই। আমি বড় জোর চেষ্টা করতে পারি বীরভূম '৭০-৭১-এর নিরিখে প্রশ্নটিকে বোঝার। আপাতত এই বোঝার চেষ্টার মধ্য দিয়েই আজকের আলোচনা শেষ করব।

উপসংহার : "কি ছিলো বাতাসে সেদিন"

নকশালবাড়িতে কিংবা ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে জমি দখলের আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং জমিই ছিল কৃষক আন্দোলনের মূল বিষয়। প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি চাই বা "লাঙল যার জমি তার" এই স্লোগানকে ভিত্তি করে লড়াই শেষ পর্যন্ত ওইসব এলাকায় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল। বীরভূমের আন্দোলন কিন্তু জমি দখলের লড়াই দিয়ে শুরু হয়নি। আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি কৃষক আন্দোলনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধারা বীরভূমে স্বাধীনতার সময় থেকেই অন্ততঃ ছিল। এমনকি ১৯৬৮-৬৯ সালেও সিপিআই, সিপিআইএম, ফরওয়ার্ড ব্লক, এসইউসিআই-এর মত সরকারি বাম দলগুলি এই জেলায় কৃষক আন্দোলন করে চলেছিল এবং জোতদারদের বিরুদ্ধে জমি দখলের অনেক লড়াই হয়েছিল। এই আন্দোলন করতে গিয়ে শহিদ হয়েছিলেন অনেক কৃষক। ১৯৪৯-এ দামড়ার কথা মনে পড়ে। সেই থেকে শুরু করে ১৯৬৮তে এসেও দেখি বোলপুর থানার দর্পশীলা গ্রামে শহিদ হচ্ছেন কমল মাল, নানুরে ছেকিন শেখ, শীরসা গ্রামে বিজয় রাণা, ইলামবাজার থানায় সালাম শেখ ... এই রকম আরও কিছু কৃষক জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জোতদারদের হাতে ও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। কিন্তু সরকারি বাম দলগুলি পালটা মার বা বদলা নেওয়ার রাজনীতির দিকে যায়নি। যাওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ ততদিনে তারা সংসদীয় গণতন্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ। ১৯৬৭তে এসে তো বটেই, তবে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই— ১৯৪৯-এর জঙ্গী কৃষকনেতা টুরকু হাঁসদা ১৯৫৭তে এসে সিউড়ির সিপিআই বিধায়ক।

প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার একটা অনিবার্য পরিণতি হয়ত তৃণমূলের কর্মীদের জঙ্গীপনার অধীক্ষা, প্রয়োজনে অবদমন। এই বিষয়ে আমরা তাত্ত্বিক সমর্থন পাই ১৯১৭ সালে প্রাভ্‌দা-এ প্রকাশিত লেনিনের "The Dual Power" সন্দর্ভে। তিনি বলছেন যে বিপ্লব জন্ম দেয় এক দ্বৈত ক্ষমতা বা dual power-এর। একদিকে থাকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক সরকার চালানোর দায়, অন্যদিকে তেমনই সংগ্রামী রাজনীতি জন্ম দেয় আরেক "সরকার"-এর যা সৈনিকের পোশাক-পড়া প্রলেতরিয়েৎ ও কৃষকের সরকার। এই দ্বিতীয় সরকারটি বিশ্বাস রাখে বৈপ্লবিক উপায়ে সরাসরি ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ায় "on the direct initiative of the people from below, and *not on a law* enacted by a centralized state power"। এবার, যারা দ্রুত প্রাতিষ্ঠানিক গবর্ণমেন্টের কলাটা-মুলোটায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তাদের এই বিপ্লবী নিচুতলার (এবং সে-কারণেই প্রধানত নিম্নবর্গীয়) জনতাকে নিয়ে পড়তে হয় ভারী সমস্যায়— যেমন আমরা দেখতে পাই সত্তরোন্মুখ বীরভূমে। একদিকে সরকারি বাম দমগুলি ক্ষমতার চেয়ারে চেপে জঙ্গীপনার পথ পরিহারে ব্যগ্র, অন্যদিকে নিম্নবর্গীয় কৃষক চাইছে তীব্রতর জঙ্গী আন্দোলন। এমতাবস্থায় তারা প্রতীক্ষিত পথনির্দেশ পায় নকশালবাদী ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের কাছে। সঙ্ঘটিত হয় বীরভূম '৭০-৭১। এই ঘটনাসংসক্তির মধ্যে দিয়ে দেখলে হয়ত আমরা কিছুটা অনুধাবন করতে পারি বীরভূমের নকশাল আন্দোলনের প্রাবল্য, তার প্রবাদপ্রতিম তীব্রতা।

তবে শুধু তাত্ত্বিক বিবৃতিতে তো আর চিঁড়ে ভিজবে না; নিম্নবর্গীয় অংশগ্রহণের ব্যাপারটা হাতে-কলমে প্রমাণ করার গুরুদায়িত্বটা থেকেই যায়। এর জন্য আবার একবার— এবং এই শেষবার— আমরা দ্বারস্থ হব ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরীর। আমরা আগেই বলেছি যে ভারতজ্যোতি তার গ্রন্থে একটি তালিকা পেশ করেছেন ৫৫ জনের যাদের সকলেই "৭১-এর সেই রক্তাক্ত দিনগুলোতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো নেতৃত্ববিহীন বীরভূমবাসী" শহিদ। এই তালিকা লেখকের মতে অসম্পূর্ণ। তবুও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হল এই যে লেখক এই ৫৫ জনের মধ্যে ৫২ জনের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণের অসম্ভব পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজটিও করেছেন। অর্থনৈতিক অবস্থানের নিরিখে এদের ১৭ জন ভূমিহীন কৃষক, ৭ জন গরিব কৃষক, ৪ জন মাঝারি কৃষক, ও ৭ জন শহুরে শ্রমজীবি। অর্থাৎ, যাঁরা খুন হলেন তাঁদের ৬৬ শতাংশের বেশি সমাজের দরিদ্রতম মানুষ। জাতি, ধর্ম, বর্ণের বিচারে এদের ২৬ জন নিম্নবর্ণ, ১৩ জন সাধারণবর্ণ, ৩ জন মুসলমান ও ৪ জন আদিবাসী। বাকিদের মধ্যে উচ্চবর্ণের মাত্র ৬ জন। অর্থাৎ, এদের প্রায় ৮৭ শতাংশ সামাজের নিচুতলার মানুষ। এদের মধ্যে ১০ জন নিরক্ষর, ১১ জন শুধুমাত্র সাক্ষর, ও ১৯ জন বিদ্যালয়ের স্তর ছুঁয়েছেন। ৫ জন বাদে এদের সকলেরই বয়স ২৫ থেকে ১৯ বা তারও নিচে। পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে ৭১-এর বীরভূমে লড়াইটা উচ্চবিত্ত-উচ্চবর্ণের লড়াই ছিল না। এতেও যাদের

প্রত্যয় জন্মাল না তাদের জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করতে একটি নমুনা সমীক্ষা চালানো হয় বোলপুর শহর ও গ্রামাঞ্চলে, ইলামবাজার থানা, দুবরাজপুর থানা, নানুর থানা, ও সাঁইথিয়া থানার অন্তর্ভুক্ত শহরে ও গ্রামে। একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি হয় ৩০০ জনের। তথ্য সংগ্রহের আয়াসসাধ্য কাজটা করেন প্রধানতঃ ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী, শৈলেন মিশ্র, আলোক মুখার্জী, লক্ষ্মী ঘোষ, ও লিয়াকত আলি। এই সমীক্ষাতেও উঠে আসে আগের তালিকাটির অনুরূপ এক চিত্র। অর্থনৈতিক শ্রেণী অনুসারে এদের মধ্যে মাত্র ২৩ জন নিজেদের মধ্য চাষী, ধনী চাষী, জোতদার বা ক্ষয়িষ্ণু জমিদার হিসেবে চিহ্নিত করে; মাত্র ৭ জন এদের মধ্যে উচ্চবিত্তের বন্ধনীতে পড়ে। জাতি/ বর্ণগত অবস্থানের নিরিখে এদের মাত্র ৫৯ জন উচ্চবর্ণের। লক্ষনীয় বিষয় এই যে এদের ৭৭ জন তপসিলী নিম্নবর্ণের ও ২৫ জন তপসিলী উপজাতির, যেখানে ১৯৭১ সালের জনগণনার রিপোর্ট জানাচ্ছে বীরভূমের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭.০৫ শতাংশ তপসিলী উপজাতি ও ৩০ শতাংশ তপসিলী নিম্নবর্ণ। এদের মধ্যে ১১ জন মহিলা (যাদের ১০ জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন) ও এদের ২৫৪ জনের বয়স আন্দোলনে অংশগ্রহণের সময়ে ছিল ২৫ থেকে ১৯ বা তারও নিচে।

নেতৃত্বের চরিত্র যাই হোক না কেন, উপরের তথ্যের আলোতে এ-কথা বলা সঙ্গত যে সত্তরের বীরভূমে নকশাল আন্দোলনের অস্থি-পেশী ছিলেন নিম্নবিত্ত-নিম্নবর্গীয় মানুষ; তাদেরই রক্তে রাঙানো বীরভূম '৭১। রণবীর সম্মাদারের মতে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও প্রাবল্যের কারণ এই গরিব কৃষক, ছাত্র, যুবক, আদিবাসী, খেটে খাওয়া মানুষের সমর্থন। এই প্রবন্ধেও তাঁর এই মন্তব্যকে সপ্রমাণ করার প্রয়াস করা হয়েছে।

আজকে দাঁড়িয়ে যখন উচ্চবর্ণদম্ভী হিন্দুত্ববাদের ধারাসারে হাড় হিম হয়ে আসে, সে বর্ষণে উপজিত কাদায় পা আটকে যায় সমাজের, বিশেষতঃ বীরভূমে, তখন এই ইতিহাস আমাদের প্রাণিত করে— শোনায় আশার উদ্গীতি।